গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com | ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

নতুন কৃষি আইন কৃষকদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

সংসদে পাশ হওয়া তিনটি সর্বনাশা বিলের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (সংশোধনী) বিল ২০২০, ফারমারস প্রোডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) বিল এবং ফারমারস (এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অফ প্রাইস অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড ফেয়ার সার্ভিসেস বিল ২০২০ নামে তিনটি সর্বনাশা দানবীয় বিল লোকসভায় পাশ করিয়েছে। এগুলি কিছুদিন আগেই অর্ডিন্যান্স আকারে তারা নিয়ে এসেছিল। এর মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রকারের ডাল, খাদ্য শস্য, তৈলবীজ, পেঁয়াজ, আলুকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষি পরিকাঠামো এবং অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও তার বন্টন পুরোপুরি দেশি এবং বিদেশি করপোরেট হাঙরদের হাতেই চলে যাবে। ফলে লাভবান হবে একমাত্র তারাই। কৃষকরা অ্যাগ্রো-মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলির দাদন নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হবেন। এ কথা স্পষ্ট যে, এই দানবীয় আইনের মধ্য দিয়ে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নীতি পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হবে। সরকারি উদ্যোগে চাল-গম সংগ্রহ করার ব্যবস্থা একসময় শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল। দরিদ্র মানুষ ও মাঝারি চাষিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যবস্থাকে বিলোপ করা হবে। এই দানবীয় আইন শুধু কৃষক নয় সমস্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

দুয়ের পাতায় দেখুন

তর্জন-গর্জনই সার, মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা কই

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি কি করোনা ভাইরাসের চেয়ে কম ঘাতক? উপমা শুনে চমকে উঠবেন না। কারণ মূল্যবৃদ্ধি নিঃশব্দ ঘাতক হয়ে কত পরিবারকে শেষ করে দিচ্ছে তার হিসাব সরকার রাখে না!

ধূর্ত মালিকরা করোনা পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বহু কর্মী ছাঁটাই করছে, অনেকের বেতন কমাচ্ছে। ফলে জনগণের দুর্দশা সীমাহীন। এই অবস্থায় সমস্ত খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি সঙ্কট জর্জরিত মানুষের উপর মারাত্মক আঘাত। মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের ৯০ শতাংশ পরিবার প্রায় অনাহার অর্ধাহার এবং অপুষ্টির কবলে। অপুষ্টির কারণে দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যার প্রত্যক্ষ কারণ মূল্য বৃদ্ধি।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সবচেয়ে বেশি ছ্যাঁকা লাগছে আলু কিনতে গিয়ে। ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি জ্যোতি আলু! কোনও কালে শুনেছেন? অন্যান্য সবজিও ৫০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে ওঠানামা করছে। পাইকারি বড় ব্যবসায়ী মহল এবং সরকারের কেউ কেউ বলছেন, টানা বৃষ্টির জন্য এতটা দাম বেড়েছে। কিন্তু সবুজ সবজির দাম বাড়ার জন্য বৃষ্টিকে যদিও কিছুটা দায়ী করা যায়! আলুর দাম বাড়বে কেন? আলু তো গুদামে চলে গেছে মার্চ-এপ্রিলে। তার দাম বৃদ্ধির সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক কি? বাস্তবে আলুর দাম বাড়ছে মজুতদার ফাটকাবাজদের দৌলতে। কাঁচা সবজির দামও চাষির হাত থেকে বাজারে আসার মধ্যে ৩০-৪০ টাকা বেড়ে যায় এই আড়তদার

দুয়ের পাতায় দেখুন

রেলকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে রাজ্যে রাজ্যে চলছে বিক্ষোভ। ছবি ঃ ১৪ সেপ্টেম্বর কর্ণাটকের কালবুর্গি স্টেশন

বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে

২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধ সফল করুন

এ আই কে কে এম এস-এর আহ্বান

দেশের আমজনতা যখন করোনা অতিমারিতে বিধ্বস্ত, গ্রামীণ কৃষক-খেতমজুর যখন সপরিবারে অনাহারের যন্ত্রণায় ছটফট করছে, ঠিক সেই সময় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারল। এমন তিনটি আইন তারা পাশ করাল যা শুধু কৃষক জীবনে নয়, সাধারণ খেটে-খাওয়া গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনেও সর্বনাশ ডেকে আনবে।

কী সেই নীতি যার বিরুদ্ধে আজ সমস্ত ভারতের কৃষক সমাজ পথে নেমেছে? প্রতিবাদ প্রতিরোধের শপথ নিচ্ছে? বিজেপি সরকার তিনটি আইন সংশোধন করেছে— ১) দি ফার্মার্স প্রডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন অর্ডিন্যান্স-২০২০, ২) দি ফার্মার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অন প্রাইস অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস অর্ডিন্যান্স-২০২০, ৩) দি এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স-২০২০। এই সব অর্ডিন্যান্স বিজেপি সরকার এ বছর জুন মাসে জারি করেছিল, যা এবার আইনে পরিণত করে দিল তারা।

দুয়ের পাতায় দেখুন

রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে

২২ সেপ্টেম্বর শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে

গণকনভেনশন

ভারতীয় রেল বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশের সর্ববৃহৎ চাকরির ক্ষেত্রও। বর্তমানে রেল শিল্পে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ। এছাড়া রয়েছেন আরও কয়েক লক্ষ বিভিন্ন স্তরের অস্থায়ী কর্মী, যাঁদের স্থায়ীকরণ জরুরি। কর্মসংস্থানের এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বেসরকারিকরণ শুরু করেছে। যার ফলে একটা বিরাট অংশের শ্রমিক কাজ হারাবেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেল ঘোষণা করেছে, যে কর্মীদের বয়স ৫৫ বছর হয়ে গেছে বা যাঁদের চাকরির মেয়াদ ৩০ বছর হয়ে গেছে তাঁদের বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হবে। ফলে এই বেসরকারিকরণ ঘিরে রেল কর্মচারী ও তার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে কাজ হারিয়ে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

৪ লক্ষ ৩২ হাজার হেক্টর জমির উপর গড়ে ওঠা ভারতীয় রেল ব্যবস্থায় রয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার কিলোমিটার বিস্তীর্ণ রেলপথ, ৭ হাজার ৭১২টি রেল স্টেশন, ১২ হাজার ৬৭১টি ট্রেন, আধুনিক সিগন্যাল সিস্টেম, বহু রেলওয়ে কলোণি, হাসপাতাল, ৪৫টি বৃহৎ ওয়ার্কশপ, ৭টি উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি। জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় গড়ে তোলা এই বিশাল সম্পত্তি মোদি সরকার পুঁজিপতিদের পাইয়ে দিতে চলেছে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধ

একের পাতার পর

বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা যায়, প্রথম আইনটির মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত রেগুলেটেড মার্কেট বা মান্ডির বাইরেও কৃষকরা যে কোনও ব্যবসাদার বা বাণিজ্যিক সংস্থার কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারবে।

দ্বিতীয় আইনটির দ্বারা বহুজাতিক কোম্পানি চুক্তিচাষের মাধ্যমে যে কোনও পণ্য কৃষকদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নিতে পারবে।

তৃতীয় আইনটির দ্বারা যে কোনও বহুজাতিক কোম্পানি বা ব্যবসাদার কৃষিপণ্য সহ অন্যান্য দ্রব্য যত খুশি কিনে মজুত করে রাখতে পারবে। এতে আইনের কোনও বাধা থাকবে না। সংক্ষেপে এই হল এই তিনটি আইনের মর্মবস্তু।

প্রথমত মনে রাখা দরকার, এই তিনটি আইন পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, সম্পর্কযুক্ত। এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। তা হল সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যকে বহুজাতিক পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য পূরণে সরকার এমন ভাবে আইন তৈরি করেছে যাতে এতে কোনও বাধা না থাকে।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সময় ওরা প্রথমে সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও ঠিক একই কাজ করছে ওরা। সরকারি পরিচালনায় কৃষিপণ্যের যতটুকু দাম পাওয়ার ব্যবস্থা এখনও আছে তাকেই ওরা ধ্বংস করে দিচ্ছে। কী সেই ব্যবস্থা? বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পরিচালনায় এ দেশে বড় বড় নিয়ন্ত্রিত বাজার বা মান্ডির সংখ্যা ২৪৭৭ এবং তুলনায় ছোট ছোট মান্ডির সংখ্যা ৪৮৪৩টি। কৃষকরা এই সব বাজারে কৃষিপণ্য নিয়ে যায় এবং সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্ট ছাড়া কোনও ব্যবসাদার এখানে চাষির কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনতে পারে না। এই মান্ডিতে কৃষককে খাজনা দিতে হয়। এর ফলে কৃষক সরকারি সহায়ক মূল্যে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে। যদিও এর মধ্যে প্রচুর দুর্নীতি হয়, কৃষকরা বঞ্চিত হয়। তবুও সরকারের তত্ত্বাবধানে বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য এই সব মান্ডিতে বেচাকেনা হয়। তাই এই মান্ডি বা নিয়ন্ত্রিত বাজার কৃষকদের কিছুটা হলেও দাম পেতে সাহায্য করে।

এখন কী হবে? মান্ডির বাইরে যথেচ্ছ কৃষিপণ্য কেনার অধিকার থাকায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিপুল টাকার ভাণ্ডার নিয়ে ময়দানে নামবে, প্রয়োজন হলে প্রথম দিকে মান্ডির থেকে বেশি দাম দেবে এবং শেষ পর্যন্ত এই সব মান্ডিগুলোকে ধ্বংস করে দেবে। আর সরকার তো এই সব বহুজাতিক পুঁজির ক্রীতদাস। তারাও এই প্রক্রিয়া সফল করতে পুঁজিপতিদের সাহায্য করবে। ফলে কৃষক সহায়ক নিয়ন্ত্রিত বাজার বা মান্ডি ধ্বংস হয়ে কৃষকরা গিয়ে পড়বে বহুজাতিক পুঁজির খপ্পরে।

কিন্তু কৃষকরা যা তৈরি করবে এই বহুজাতিক পুঁজি তা-ই কিনবে, বিষয়টা তো এমন নয়। তারা কিনবে তাদের পছন্দমতো জিনিস। অর্থাৎ যে জিনিসের বাজার আছে, যে জিনিস বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা ঘরে তোলা যাবে। আর এই জন্য দরকার চুক্তি চাষ। দ্বিতীয় আইনে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তি হবে কাদের মধ্যে? বহুজাতিক কোম্পানির সাথে দুই/তিন বিঘা জমির মালিকদের। দাম ঠিক করবে কে? বহুজাতিক কোম্পানি। পণ্যের গুণমান ঠিক করবে কে? বহুজাতিক কোম্পানি। আইনে বলা হয়েছে, কৃষকের কাছ থেকে পণ্য নেওয়ার সময় তিন ভাগের দু'ভাগ দাম দিতে হবে। বাকি টাকা পণ্যের গুণমান ঠিক করার পর দিতে হবে। এখানেই তো মার। কোম্পানিগুলো তো সততার মূর্ত প্রতীক নয়। তারা বলবে তোমার পণ্য উপযুক্ত গুণমানের নয়। ফলে আর কোনও টাকা পাবে না। কী করবে কৃষক? এই সব বহুজাতিক কোম্পানির সাথে সে আইনি লড়াই করে পারবে? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে তাকে পথে বসতে হবে। যে সব দেশে চুক্তিচাষ জোর কদমে চালু হয়েছে, সেই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে।

এই ভাবে সমস্ত কৃষিজ দ্রব্যের উপর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ওরা কী করবে? ওরা কৃষকের কাছ থেকে জলের দরে কৃষিপণ্য কিনবে এবং চড়া দামে তা সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করবে। চাষি থেকে ক্রেতা সকলেই শোষিত হবে। এই ভাবে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলবে ওরা। ইচ্ছা করলে বাজারে মালের জোগান কমিয়ে দিয়ে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অনেক বেশি বেশি মুনাফা ঘরে তুলবে ওরা। তৃতীয় আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

বেসরকারিকরণ করে বহুজাতিক পুঁজির হাতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য ক্ষেত্র তুলে দেওয়ার বিষময় ফল কী, তা আমরা সবাই জানি। এই সব এখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। টাকার অভাবে করোনা রোগীকে নার্সিংহোমের বাইরে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়, এমন ঘটনাও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। পুঁজিপতিদের কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। মুনাফা ছাড়া এই দুর্বৃত্ত পুঁজিবাদ আর কিছু বোঝে না। এদের হাতে যদি চাল গম ডাল তৈলবীজ আলু সব্জি ফল দুধ হাঁস মুরগি ছাগল শুয়োর মাছ পাট তুলো পশুখাদ্য ইত্যাদির একচেটিয়া অধিকার চলে যায় তা হলে জনজীবনে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে আসবে, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই।

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার জনজীবনে এই সর্বনাশ নামিয়ে আনছে, নামিয়ে আনছে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের পথ অনুসরণ করে, তাকে আরও বীভৎস রূপে কার্যকর করে।

এরই বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে দেশের বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলোর সাথে একযোগে ২৫ সেপ্টেম্বর এআইকেকেএমএস গ্রাম ভারত বনধ-এর ডাক দিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ এই বনধকে সর্বাত্মক সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা কই

একের পাতার পর

এবং পাইকারি বাজারের বড় ব্যবসায়ীদের দৌলতেই। এদের নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা কী?

কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার মুখে যাই হম্বিতম্বি করুক, তাদের ভূমিকা কার্যত মজুতদার ফাটকাবাজদের স্বার্থ রক্ষা করছে। রাজ্য সরকারের ব্যাখ্যা, আলুর উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ১৩ টাকার মতো। তাই পাইকারিতে তা কেজি প্রতি ২২ টাকায় বিক্রি করার ছাড়পত্র দিচ্ছে সরকার। তাহলে নাকি কেজিতে অন্তত ৯ টাকা লাভ থাকবে চাষির। এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার চাষির অবস্থা সম্পর্কে সরকারের হয় কোনও ধারণা নেই, না হলে জেনেশুনে তারা মিথ্যা বলছে। বেশিরভাগ চাষি যখন আলু বিক্রি করেছেন তখন কিলোতে ৬-৮ টাকার বেশি ওঠেনি। মুষ্টিমেয় বড় চাষি কিছুটা আলু নিজেরা হিমঘরে রাখলেও বেশিরভাগ চাষির পক্ষে বেশিদিন আলু ধরে রাখা সম্ভব নয়। কারণ টাকা আটকে থাকলে তার ধার শোধ হবে না। ফলে আলু ওঠার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা চলে গেছে বড় আড়তদার, মহাজনের কবলে। বেশিরভাগ চাষির হাতে এখন আলু নেইও। কাজেই দাম বেঁধে দেওয়ার সুবিধা পুরোটাই লুটে নেবে তারাই। পাইকারি বাজারে আলু বা সবজির দাম কত হবে তা ঠিক করে এইসব আড়তদার, মজুতদারদের সংগঠিত চক্র। তার উপর সমস্ত খাদ্য ফসলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার 'ফরোয়ার্ড ট্রেডিং'য়ের নীতি চালু করায় মাঠে ফসল থাকতে থাকতেই তা নিয়ে শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলা চলে। ফাটকার কারবারিদের কারসাজিতে দাম যখন তখন বাড়ে-কমে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সম্প্রতি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনকে অকার্যকরী করে দিয়েছে। কৃষি পণ্যের পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসাতে দেশি বিদেশি একচেটিয়া মালিকদের ঢোকার অবাধ রাস্তা খুলে দিয়েছে। বড় বড় কোম্পানিগুলিকে অধিকার দিয়ে দিয়েছে দাদন দিয়ে চাষিকে চাষ করানোর। এই সব কোম্পানির হাতেই চলে যাবে ফসলের দাম নির্ধারণের একচ্ছত্র অধিকার। ফলে ক্ষুদ্র-মাঝারি কৃষক, ছোট ব্যবসায়ীরা চরম সংকটে পড়বেন।

এই রাজ্য সরকার লোক দেখানো পুলিশি নজরদারি চালাতে পারে, কিন্তু তা এই চক্রের গায়ে আঁচড়টিও কাটবে না। কার্যকরী কিছু করতে গেলে এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধতা করার প্রয়োজন।

মূল্যবৃদ্ধিতে আরও ইন্ধন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের লাগাতার পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়ানোর নীতি। তার ফলে পরিবহণের ভাড়া বেড়েছে। বেড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। সরকার গত এক বছরে ধারাবাহিক ভাবে গ্যাসের দাম ১০০ টাকার মতো বাড়িয়েছে। গ্যাসে ভর্তুকি প্রায় তুলেই দিয়েছে। করোনা সংকটের মধ্যে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে সরকার এ কাজটি করেছে। যখন জনগণের পাশে দাঁড়ানো জরুরি ছিল তখন সরকার এ ভাবে জনগণের উপর উৎপীড়ন চালিয়েছে।

অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের গদির জোরকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি একদিকে আওয়াজ তুলছে ভোটে জিতলে তারা সোনার বাংলা গড়বে। অন্যদিকে রাজ্যের তৃণমূলও বলে চলেছে তাদের রাজত্বে 'এগিয়ে বাংলা'। কংগ্রেস-সিপিএমও এখন জনদরদের ভেক নিয়ে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বলে চলেছে। অথচ এই দলগুলি যখন যেখানেই ক্ষমতায় থেকেছে মূল্যবৃদ্ধিতে ইন্ধন দিয়েছে। কৃষিপণ্যকে বৃহৎ পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার কাজটা শুরু করেছে কংগ্রেস। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকার সময়তেই চুক্তি চাষ, আলু, ধান, পাট সহ সমস্ত ফসলে অবাধ মজুতদারি-ফাটকা চলতে দিয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনকে প্রয়োগ করে দাম কমানো দূরে থাক, এই আইনকে দুর্বল করা তারাই শুরু করেছে। এখন বিজেপি কেন্দ্রে তা পুরো তুলেই দিল। এস ইউ সি আই (সি) দল বারবার দাবি করেছে এই পরিস্থিতিতে মানুষকে সুরাহা দিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি খাদ্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করুক। কিন্তু কোনও দলের সরকার সেই কাজটি করেনি। ফলে একথা আজ পরিষ্কার এই দলগুলির একে অপরের বিরুদ্ধে তোলা স্লোগান থেকে এদের প্রকৃত চরিত্র বুঝলে ভুল হবে। এরা সকলেই পুঁজিপতিশ্রেণির সেবাদাস হিসাবেই কাজ করে চলে। বুঝতে হবে ভোটে সরকার পরিবর্তনের দ্বারা এই চক্র থেকে মুক্তিনেই। কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি এই মূল্যবৃদ্ধির আঁতুড়ঘর। তাকে উৎখাত না করলে এর ছোবল থেকে রেহাই মিলবে না।

কৃষকদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবে

একের পাতার পর

এই আইন সামগ্রিকভাবে কৃষক বিশেষত মাঝারি এবং ছোট কৃষকদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে। ইতিমধ্যেই চার লক্ষের বেশি কৃষক এবং খেতমজুর আত্মহত্যা করেছেন। কোনও সন্দেহ নেই এই সর্বনাশা নীতি একদিকে দরিদ্র কৃষকদের আরও বেশি করে ধ্বংস ও আত্মহননের পথে ঠেলে দেবে। একই সাথে ধনী চাষি, গ্রামীণ জোতদার এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সর্বোচ্চ মুনাফার সুযোগ আরও বাড়িয়ে দেবে।

এই পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনগুলির কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এআইকেএসসিসি), যার অন্যতম সদস্য এ আইকে কে এম এস, ২৫ সেপ্টেম্বর সারা ভারতের গ্রামীণ এলাকায় বনধের ডাক দিয়েছে। আমরা জনবিরোধী এবং কৃষক বিরোধী এই তিনটি আইনের প্রতিবাদে আহূত এই বনধকে সর্বতোভাবে সমর্থন করছি।

জনগণের কাছে আমাদের আবেদন, এই জনবিরোধী নীতি অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত করুন।

দিল্লি গণহত্যার পুলিশি তদন্ত গণতন্ত্রের কলঙ্ক

বলছেন প্রাক্তন আইপিএসরা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে কোনও রকম বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে যে ভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে, দেশদ্রোহে অভিযুক্ত করে প্রতিবাদীদের জেলে ভরছে, গণতান্ত্রিক মানুষমাত্রেই তার তীব্র প্রতিবাদ করছেন। বিচার ব্যবস্থার অভ্যন্তরের ব্যক্তিরাও সরকারের অগণতান্ত্রিক এমন সব কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এবার প্রশাসনের অভ্যন্তরের ব্যক্তিরাও বিজেপি সরকারের অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। সম্প্রতি নয় জন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার, যাঁরা সকলেই 'কনস্টিটিউশনাল কনডাক্ট গ্রুপ'-এর সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে সরকারের বিশ্বস্ত আমলা হিসাবে নানা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলিতে কাজ করে এসেছেন, তাঁরাও বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন।

এ বছর ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে বিজেপি নেতাদের নেতৃত্বে যে একতরফা দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল, দিল্লি পুলিশ তার যে তদন্ত করছে তাকে একতরফা, রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক এবং সংখ্যাগুরুবাদের চরম নিদর্শন বলে দিল্লির পুলিশ কমিশনার এস এন শ্রীবাস্তবকে এক খোলা চিঠিতে অভিযোগ করেছেন এই পুলিশ অফিসারেরা। এই অফিসারেরা তাঁদের ক্ষোভ গোপন না করেই বলেছেন, দিল্লি পুলিশ যে ভাবে দিল্লি দাঙ্গার তদন্ত করছে তাতে ভারতীয় পুলিশের ইতিহাসে আজ এক দুর্ভাগ্যময় দিন। তাঁরা চিঠিতে বলেছেন, পুলিশের এই তদন্ত দাঙ্গার শিকার সংখ্যলঘু মানুষগুলির এবং তাঁদের পরিবারের কাছে বিচারকে প্রহসনে পরিণত করবে এবং সংখ্যাগুরু অংশের যে দুষ্কৃতীরা এই দাঙ্গায় জড়িত তারা এমন দুষ্কর্মের লাইসেন্স পেয়ে যাবে।

এই কনস্টিটিউশনাল গ্রুপের একজন অত্যন্ত সিনিয়র সদস্য জুলিও রিবেইরো, যিনি মুম্বই, গুজরাট এবং পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান ছিলেন এবং রাষ্ট্র যাঁকে পদ্মভূষণ পুরস্কার দিয়েছে, তিনি আগেই দাঙ্গার এই তদন্ত সম্পর্কে শ্রীবাস্তবকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, কমিশনার যেন তাঁর কমান্ডের সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁরা তাঁদের চাকরিতে যে শপথ নিয়ে ঢুকেছিলেন, তা মেনে চলছেন কি না। তিনি চিঠিতে প্রশ্ন তুলেছেন, বিজেপির যে নেতারা দাঙ্গার আগে উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়েছিলেন দাঙ্গার চার্জশিটে তাঁদের নাম নেই কেন?

উল্লেখ্য, দিল্লি দাঙ্গায় পুলিশ যে চার্জশিট পেশ করেছে তাতে যে ১৫ জনের নাম রয়েছে তাঁরা সকলেই নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র, প্রবেশ ভার্মা এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, যাঁরা প্রকাশ্যে এই দাঙ্গায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন, তাঁদের কারও নামে পুলিশ এফআইআর পর্যন্ত করেনি। অথচ দিল্লি সংখ্যালঘু কমিশনের তথ্য সংগ্রহকারী দল এদের সকলকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

আইপিএস অফিসারেরা চিঠিতে বলেছেন, দিল্লি পুলিশ এই দাঙ্গায় যারা অপরাধী তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই তদন্ত চালাচ্ছে, যা ন্যায্য তদন্তের পদ্ধতিকেই লঙ্ঘন করছে। বলেছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের যে, যাঁরা সিএএ-র বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন এবং প্রতিবাদে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের এই মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রতিবাদ করাটা তাঁদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার।

তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এমন ধরনের পুলিশি তদন্ত জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং সংবিধান সম্পর্কেই সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে। যা শেষপর্যন্ত সমাজের শৃঙ্খলাকেই নাড়িয়ে দেবে। তাই আমরা এই দাঙ্গা মামলার তদন্ত পুনরায় সততার সঙ্গে এবং পক্ষপাতশূন্য ভাবে করার জন্য অনুরোধ করছি, যাতে আক্রান্তরা এবং তাঁদের পরিবারগুলি আইনের শাসন মেনে সঠিক বিচার পায়।

১ সেপ্টেম্বর ঃ স্মরণে থাকবেন ছাত্র-শহিদরাই অত্যাচারী পুলিশ নয়

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে চারদিক ঘিরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে যে গণহত্যা চালিয়েছিল, সেখানে হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী মানুষ শহিদ হয়েছিলেন। যা দেখে শিউরে উঠেছিলেন দেশের আপামর জনসাধারণ। শপথ নিয়েছিলেন ভগত সিং, বয়স তখন তাঁর ১২। নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বর গণহত্যার বিরুদ্ধেঅসংখ্য ছাত্র যুবক বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন ভারতে পুলিশী অত্যাচার থাকবে না, মানুষ অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা পাবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। নেতাজির ভাষায় সাদা চামড়ার শাসকের জায়গায় বসল কালো চামড়ার শাসক।

এই ঘটনার ঠিক ৪০ বছর পর স্বাধীন ভারতে এই বাংলায় খাদ্যের দাবিতে ভুখা মানুষ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় জড়ো হয়। কলকাতার রাজপথে হাজারে হাজারে মানুষ 'খাদ্য চাই খাদ্য দাও' এই স্লোগান দিতে দিতে যখন ধর্মতলা অভিমুখে মিছিল দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের পুলিশ জালিয়ানওয়ালাবাগের কায়দায় চারদিক থেকে ঘিরে ভুখা মানুষের উপর লাঠি ও গুলিবর্ষণ শুরু করল। হাজার হাজার মানুষ রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ২০০ জনেরও বেশি গরিব কৃষক, মজুর, ছাত্র-যুবক, শিশু শহিদ হলেন। মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখানোর জন্য বহু লাশ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। গঙ্গার জল রক্তে লাল হয়ে গেল। ৮০ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেল। প্রতিবাদে স্তব্ধ হল বাংলা! নেতাজি ক্ষুদিরামের উত্তরসূরী এ বাংলার বামপন্থী গণতন্ত্রপ্রিয় ছাত্র যুব সমাজ তীব্র প্রতিবাদে, ঘৃণায় ও ক্ষোভে ফেটে পড়ল। পরের দিন ১ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবাংলার প্রান্তে প্রান্তে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ সংঘটিত হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে হাজারে হাজারে প্রতিবাদী ছাত্র জমায়েত হলেন। জামার বোতাম খুলে দৃপ্ত পদক্ষেপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লন থেকে ছাত্ররা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মিছিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির দিকে এগোতে থাকল। মিছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি আসতেই আবারও কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ ছাত্রদের বুক লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করল। ৮ জন তরতাজা ছাত্র শহিদের মৃত্যু বরণ করলেন। শোকস্তব্ধ ছাত্রসমাজ প্রতিবাদের শপথ নিল। প্রতিবাদ জানালেন ছাত্র-শিক্ষক অধ্যাপক ও পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডক্টর ত্রিগুণা সেন ঘৃণায় ক্ষোভে কালো পতাকা উত্তোলন করলেন এবং বাংলার ছাত্র সমাজকে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক প্রশান্ত বসু শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে বক্তব্য রাখেন। সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ সহ সমস্ত জায়গায় ছাত্র-শিক্ষকরা মিলে গভীর আবেগের সঙ্গে এই শহিদদের স্মরণের পাশাপাশি এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেপ্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নিলেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই দিনটি সাধারণ গরিব মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে, শিক্ষার উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অঙ্গীকারবদ্ধহওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রশহিদ দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। দিনটিকে স্মরণ করে ছাত্ররা শপথ নিচ্ছে যে-কোনও অন্যায়-অত্যাচার, শিক্ষা সংহারের বিরুদ্ধেআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। তারই অঙ্গ হিসাবে প্রতি বছর ছাত্র যুব সাধারণ মেহনতি মানুষ ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর শহিদ দিবস হিসাবে স্মরণ করে আসছেন। কংগ্রেসী জামানার পতনের পরে যখন এ রাজ্যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল তখনও ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর নির্দেশে 'নিরামিষ আন্দোলনকে আমিষ করতে' সিপিএমের পুলিশ আন্দোলনকারীদের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালাল। ৩৪ জন গুলিবিদ্ধ হন এবং শহিদ হন কিশোর কর্মী মাধাই হালদার। আবারও পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরের দিন ১ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবাংলার প্রতিটি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

যেদিনে গণআন্দোলনের ইতিহাসে পুলিশ বাহিনী কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছিল সেই দিনটিকেই এ রাজ্যের বর্তমান তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী পুলিশকে তুষ্ট করতে 'পুলিশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করলেন। আর এই দিবস ঘোষণার মধ্যে দিয়ে পুলিশের বর্বরতাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকৃতি দিয়ে চূড়ান্ত স্বৈরাচারী ভূমিকা প্রকাশ করলেন। যা দেশে দেশে শাসকের নগ্ন ঘৃণ্য চরিত্রই প্রকাশ করল, যার সঙ্গে পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিশ কিংবা কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপির পুলিশের কোনও পার্থক্য থাকল না। তাই ছাত্র শহিদ দিবসকেই বেছে নিতে হল 'পুলিশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করার। সরকারের এমন আচরণকে ধিক্কার জানাই। আসুন এর প্রতিবাদে সোচ্চার হই।

পাঁচ মাসে ২ কোটি ১০ লাখ চাকরিজীবী ছাঁটাই

সিএমআইআই-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা দেখাচ্ছে, লকডাউন ঘোষণার পর পাঁচ মাসে ভারতে বাঁধা বেতনের ২ কোটি ১০ লাখ চাকরিজীবী কাজ হারিয়েছেন। ২০১৯-২০ সালে দেশে বাঁধা বেতনের চাকরি ছিল ৮ কোটি ৬০ লাখ। লকডাউন ঘোষণার পাঁচ মাসের মধ্যে তা নেমে এসেছে ৬ কোটি ৫০ লাখে।

এই ছাঁটাইয়ের জন্য লকডাউনকে দায়ী করা হলেও বাস্তবে দেশে ছাঁটাইয়ের একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছিল। ২০১৬-১৭ সালে দেশে চাকরি ছিল ৮ কোটি ৬৩ লাখ। ২০১৯-২০ সালে লকডাউনের আগেই তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৬১ লাখ। অর্থাৎ, ৩ বছরে ছাঁটাই হয়েছে ২ লাখ চাকরিজীবী। বছরে প্রায় ৬৭ হাজার। মাসে ছাঁটাই প্রায় সাড়ে ৫ হাজার। এটার জন্য কোন ভাইরাস দায়ী?

এর জন্য দায়ী অবশ্যই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। শোষক পুঁজিপতিদের সমস্যা হল, এই সত্যকে তারা স্বীকার করতে পারে না। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

ফলে ওরা স্বীকার না করলেও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ছাঁটাই চলে। কেন চলে? কারণ, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। বা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। সর্বোচ্চ মুনাফার অন্যতম শর্ত উৎপাদন ব্যয় কমানো। উৎপাদন ব্যয় কমানোর অনেক শর্তের মধ্যে অন্যতম হল কম শ্রমিক দিয়ে বেশি সময় কাজ করানো। ফলে, শ্রমিক ছাঁটাই পুজিবাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম। এই অর্থনীতি বহাল থাকলে কোনও রাম রাজত্বই শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধকরতে পারে না।

এই অর্থনীতি বহাল থাকলে কোনও ত্রাণ প্যাকেজ মন্দার গহ্বর থেকে পুঁজিবাদকে বাঁচাতে পারে না। কারণ, মন্দার মূলে রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস। সিএমআইআই-এর যে সমীক্ষা নিয়ে এই আলোচনার সূচনা, সেই তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ১৩০ কোটির বেশি জনগণের দেশ ভারতে মাত্র সাড়ে ছ'কোটি মানুষের নিশ্চিত কাজ ও বেতন আছে। চাকরিজীবী পিছু চারজন করে লোক ধরলে মোট ২৬ কোটি মানুষের নিশ্চিত খাওয়া পরার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ, ১০৪ কোটিরও বেশি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা টলমল। এই কারণে বলা হয় এই অর্থনীতি মরণাপন্ন। এই অর্থনীতিকে ত্রাণ প্যাকেজের ঠেকনা দিয়ে কদ্দিন খাড়া করে রাখা

পাঁচের পাতায় দেখুন

‘ত্রিভাষা নীতি’ আসলে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র

২৯ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০’ পাশ হয়েছে। দেশ যখন করোনা অতিমারির ভয়াবহতায় কম্পমান, বেঁচে থাকার রসদ জোগাড়ই মানুষ দিশাহারহ। ঠিক সেই সময় শিক্ষাবিদ-শিক্ষক-গবেষক-ছাত্র-শিক্ষানুরাগী মানুষের কোনও মতামত না নিয়ে একতরফাভাবে শিক্ষানীতি ঘোষণা করে দিয়েছে। যে নীতি দেখে শিক্ষাবিদদের অভিমত এর সাহায্যে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার যতটুকু সুযোগ ছিল তার বনিয়াদকেই ধ্বংস করা হয়েছে।

শিক্ষানীতিতে শিক্ষাস্বার্থবিরোধী সে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল ভাষা শিক্ষা। ‘মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম অ্যান্ড পাওয়ার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ’ নামে শিক্ষানীতির এই অংশে বলা হয়েছে ছোট বয়সেই শিশুরা দ্রুত ভাষা শিক্ষতে পারে। ফলে অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এবং সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পাশাপাশি আরও দুটি ভাষা শেখানোর কথা বলা হয়েছে। মাতৃভাষা ছাড়া বাকি দুটি ভাষা হবে ভারতীয় ভাষা। এ দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কোনও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষানীতির নিদান ‘ত্রিভাষা’ নীতি।

প্রথমত, বিভিন্ন রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত ও স্বীকৃত। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ও পাঠ্য বই উভয়ই রয়েছে। তা হলে, বর্তমান নীতিতে পঞ্চম বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলে সরকার নতুন কি করল? দ্বিতীয়ত, এটা স্বীকৃত যে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ ভাষা হল ‘চিন্তার বাহন’। যে কোনও মানুষ তার চিন্তা বা ভাবকে সর্বোন্নতরূপে মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করতে পারে। ফলে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করার দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। তা হলে, কেবলমাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্তই তা অবশ্যিক কেন? তবে কি দেশের সংবিধান স্বীকৃত ২২টি ভাষাকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার নামে আসলে বিভিন্ন মাতৃভাষা শেখা ও চর্চা করার গুরুত্ব ও পরিসরকে সংকুচিত করার উদ্দেশ্যেই এই চক্রান্ত? একই সাথে প্রশ্ন, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উচ্চবিত্তদের জন্য চালু যখন থাকছে, বাকি স্কুলে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শেখানোর কথা স্পষ্ট করে বলা হল না কেন?

বর্তমান নীতিতে ইংরেজি ভাষার গুরুত্বকে লঘু করে দিয়ে শিক্ষার উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। স্বদেশীয়ানার চ্যাম্পিয়ানরা ইংরেজির বিরুদ্ধে প্রায়শই বিষোদগার করে। অন্যদিকে দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ হিন্দিতে কথা বলে এই যুক্তিতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। বলা হয় হিন্দিই স্বদেশী জাগরণের মাধ্যম, হিন্দিই জুড়বে দেশকে। গত ২০আগস্ট, ‘মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়’-এর এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক খোলাখুলি বললেন—দেশকে জোড়ার মাধ্যম হতে পারে হিন্দি। বললেন—প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্ভার হাতে পেতে সংস্কৃতের প্রসারেও জোর দেওয়া উচিত। যথার্থই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে এল। দীর্ঘদিন থেকে আরএসএস—বিজেপি শিবির স্বদেশীয়ানার নামে হিন্দি—হিন্দু — হিন্দুস্থানের পক্ষে এবং ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য চর্চার মাধ্যমরূপে সংস্কৃত ভাষা বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্যে সে প্রচার চালাচ্ছে তা শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দিলেন। সংস্কৃতের কথায় পরে আসছি।

ইংরেজির গুরুত্ব কি আজকের ভারতীয় সমাজে উপেক্ষা করা সম্ভব? নবজাগরণ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। অচিরেই এই ভাষা ভারতবর্ষের বিরাট অংশের মানুষের ভাব বিনিময় ও যোগাযোগের মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডে উৎপত্তি হলেও ইংরেজি ভাষা এদেশে শিকড় তৈরি করেছে। আজ আর ইংরেজিকে বিদেশি ভাষা বলা চলে না। ইংরেজি এদেশে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য বিদেশি শাসকরা চেয়েছিল ইংরেজি শিক্ষায় রাশ টানতে। আর নবজাগরণের মনীষীরা চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হোক। এই ইংরেজিই জাতীয়তাবাদকে জাগাতে সাহায্য করেছে। প্রাদেশিকতার গণ্ডি ভেঙেছে। আজ ভারতের বহু জনগোষ্ঠী রোমান হরফ ব্যবহার করেই মাতৃভাষার চর্চা করে। অন্তত ৬টি রাজ্যের সরকারি ভাষা ইংরেজি।

অন্যদিকে স্বদেশীয়ানার চাম্পিয়ান সাজা ‘হিন্দিপ্রেমী’ আরএসএস ব্রিটিশের দালালি করেছে। আমরা দেখেছি স্বাধীন ভারতে আংরেজি হটাওয়ের স্লোগান তুলেছিল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দল কংগ্রেস। তারা স্বদেশীয়ানার নামে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা- প্রাদেশিকতা নিয়ে বারে বারে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বাধিয়েছে। বিজেপিও তাই করেছে। ইংরেজি ভাষা উন্নত চিন্তার বাহন বলেই শাসকরা তার চর্চাকে আটকাতে চেয়েছে। বামপন্থার কথা বলা সিপিএমও মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের কথা বলে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছিল। অথচ ধনীর ঘরের দুলালদের জন্য বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় তা চালু রাখা হয়েছিল। উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তানদের ইংরেজি শেখার সুব্যবস্থা রেখে নিম্নবিত্ত ঘরের সন্তানদের কাছ থেকে ইংরেজি কেড়ে নিয়ে তাদের মুর্খ করে রাখার চক্রান্ত সেদিন তারা করেছিল। তার বিরুদ্ধে এ রাজ্যে দীর্ঘ ১৯ বছর আন্দোলন হয় এবং প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরে আসে। আজ বিজেপিও একই দুরভিসন্ধি নিয়ে চলছে।

নবজাগরণের মহান মনীষী রামমোহন রায় এ দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আজীবন লড়াই করেছিলেন। ১৮২৩ সালে যখন ব্রিটিশ সরকার এদেশে বেনারস, মাদ্রাজ ও কলকাতায় তিনটি সংস্কৃত কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন রামমোহন তার তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন ‘সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশকে অন্ধকারে নিমগ্ন রাখার একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। যে বৈদিক মতবাদ বিশ্বাস করতে শেখায়, কোনও দৃশ্যমান বস্তুরই অস্তিত্ব নেই, তা যুবকদের সমাজের উন্নত সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপযোগী হবে না। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে যে সব বিষয় চালু রয়েছে সেগুলি পড়ানোর জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করছে। ...ছাত্রছাত্রীরা সেখানে দু’হাজার বছর আগে যা জানা ছিল সেই সব জ্ঞানই শুধু অর্জন করবে।” ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদেশের নবজাগরণের বলিষ্ঠ প্রতিভূ হিসেবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপর কি অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা আমরা জানি। তিনি বলেছেন —“...ছাত্ররা যখন দর্শন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজি ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইউরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা তাদের হবে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সম্ভব হবে।”

গণিত শিক্ষা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন “.... আমি শুধু বলতে চাই যে, সংস্কৃতের বদলে ইংরেজির মাধ্যমে গণিত শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে”। বিবেকানন্দ নিজে হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা হয়েও ইংরেজির বিরোধিতা না করে, ইংরেজদের বিরোধিতার কথা বলেছিলেন। তিনি সংস্কৃতের গদাই লস্করি চাল থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে বলেছিলেন। ফলে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার অর্থ হল এ দেশে আপামর গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের কাছে উন্নত চিন্তার সংস্পর্শে আসার পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া, যা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। প্রাচীন ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের গবেষণা এবং চর্চা এক জিনিস আর তাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে স্কুল ছাত্রদের ঘাড়ে চাপানো অন্য বিষয়। আধুনিক ভাষাবিদদের মতে বাংলা বা হিন্দি কোনও ভাষাই আজ সংস্কৃত অনুসারী নয়। তাদের ব্যকরণ আজ সংস্কৃতকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে।

আবার ‘ত্রিভাষা’ নীতিতে হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় ভাষা শেখার নামে। এ হল—আরএসএস—বিজেপির সেই চিন্তা যাকে হাতিয়ার করে তারা হিন্দি-হিন্দু-হিন্দিস্তান গড়ার লক্ষ্যে অনড়। তারা মনে করে হিন্দি ভাষার মাধ্যমেই জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠবে এবং হিন্দি হল এদেশের ভাষা। একটু গভীরে গিয়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব বিজেপি-আরএসএসের এ হেন চিন্তা যা জাতীয় শিক্ষা নীতির মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন তা সম্পূর্ণরূপে একটি অসার চিন্তা। যার ভবিষ্যৎ ফলাফল হবে অত্যন্ত মারাত্মক। যা তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিসরকে আরও প্রসারিত করবে।

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মানুষ সেই এলাকার অর্থনীতি ও উৎপাদনে অংশগ্রহণ করার জন্য পরস্পরের মধ্যে যে ভাবের আদান-প্রদানে লিপ্ত হয়। তাকে ভিত্তি করেই একটা ভাষা সৃষ্টি হয়। এবং তা গরিব-ধনী, শাসক-শোষিত, ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে সকলের ভাষা রূপেই গড়ে ওঠে। আবার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সামন্ততন্ত্র তথা কুটির শিল্প ও চাষবাস ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভেঙে বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা থেকে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত আমোঘ নিয়মই হল জাতীয় বাজার গড়ে তোলা। জাতীয় বাজার গড়ে ওঠার পথে ওই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের একাধিক ভাষা পরস্পর আদারন-প্রদানে লিপ্ত হয় ও কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাষা বিকশিত হয়ে জাতীয় ভাষা বা কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষা বিকশিত হয়ে জাতীয় ভাষা রূপে গড়ে ওঠে। বিশ্ব পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু স্তরে এ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ অত্যন্ত দুর্বলরূপে এবং আপসের মধ্য দিয়ে ঘটার ফলে একটি জাতীয় ভাষার বিকাশ এখানে সম্ভব হয়নি।

বিপ্লবভীত পুঁজিবাদ জাতীয়ভাষার বিকাশে শুধু অন্তরায়ই হয়েছে তাই নয়, সে এ দেশের ভাষা সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। বরং ইংরেজি ভাষা জাতীয়তাবোধের বিকাশে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অনেকটা সাহায্য করে গেছে। হিন্দি বা অন্য কোনও ভাষা এই কাজ করতে পারেনি। তা হলে, হিন্দি ভাষার মধ্য দিয়ে দেশকে জোড়ার এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা বিজেপি করছে তা কি সঠিক পথ হরে পারে? না, তা কখনওই যথার্থ বৈজ্ঞানিক পথ হতে পারে না। একটা ভাষাকে জোর করে অন্য ভাষাভাষী মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কখনওই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়না। বরং বর্তমান মরোণ্মুখ পুঁজিবাদ এই পথে দেশের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট।

এই চিন্তার ফলশ্রুতি একটি বিশেষ ভাষার আধিপত্য কায়েম করা হবে যা দেশের জাতীয় পুঁজির আঞ্চলিক পুঁজির উপর আধিপত্যবাদ কায়েম করতেই সাহায্য করবে। এ সহজে মানুষ মেনে নেবে না। ফলে ভাষাগত বৈরিতা, আর তা নিয়ে হানাহানি ভাঙবে মানুষের ঐক্য। যার প্রতিফলন বিগত দিনে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। একই সমস্যা আসাম সহ অন্যান্য রাজ্যেও বারবার মাথাচাড়া দিয়েছে।

বুঝতে হবে, বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের পক্ষে কোনও একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে বিকশিত করা আজ আর সম্ভব নয়। এই কাজ করতে পারে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যে ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষাকে বিকশিত করার পথেই একটি জাতীয় ভাষা গড়ে তোলার সঠিক বিজ্ঞানসম্মত পথ অনুসৃত হয়,। ফলে ‘ত্রিভাষা’ নীতির দ্বারা হিন্দি বা সংস্কৃকে চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান ব্যবস্থায় মাতৃভাষা এবং ইংরেজি—এই দুই ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে বিবেচিত করাই সঠিক পন্থা হওয়া উচিত। অন্য যে কোনও পরিকল্পনায় আসলে পুঁজিবাদের স্বার্থে মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করা এবং নতুন করে আধিপত্যবাদ কায়েম হওয়ার পন্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘৃণ্য পরিকল্পনাকে প্রতিহত করতে আমাদের সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের খোঁজই রাখে না কেন্দ্রীয় সরকার

করোনা পরিস্থিতিতে ভারতের সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কেমন? ভাবতে গেলেই কয়েকটি মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। অস্থির করে দেয়। ভাবায়, এমনটা হওয়া কি অবশ্যম্ভাবী ছিল! সেই ছোট্ট শিশুটা, যে রেলস্টেশনের প্ল্যাটফরমে মায়ের চিরনিদ্রা ভাঙানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছিল— ভোলা কি যায়! কিংবা সেই রেললাইনে ছড়িয়ে থাকা রক্তমাখা রুটি আর জুতোগুলি, ঘরে ফেরার জন্য মরিয়া অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যর্থ চেষ্টার শেষ নিদর্শন হয়ে যেগুলি কাঁদিয়েছে বহু মানুষকে। ভুলতে পারবে দেশের মানুষ সেই বাবাকে, যিনি শত শত মাইল হেঁটে চলতে চলতে নিজের কোলে তৃষ্ণার্ত সন্তানের মৃত্যু দেখেছেন!

অথচ কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার লোকসভায় জানিয়ে দিয়েছেন, লকডাউনের কারণে পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে এমন কোনও তথ্য সরকারের কাছে নেই। কারণ, এমন তথ্য রাখার কোনও রেওয়াজই সরকারের নেই। মন্ত্রীমশাই বড় উপকার করলেন। কারণ এ দেশের সরকার যে খেটে খাওয়া মানুষকে মানুষ বলেই মনে করে না, তা বোঝাতে এই একটি বাক্যই যথেষ্ট। এরপর আর আলাদা করে বুঝতে হয় না, লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের এই নিদারুণ দুর্দশা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কেন একটি বাক্যও ব্যয় করার দরকার বোধ করলেন না! কেন শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর কথা ভাবতে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাসেরও বেশি সময় লাগল! ঘরে ফিরতে চাওয়া শ্রমিকদের খুব সামান্য অংশেরই তাতে ঠাঁই হলেও দীর্ঘ পথে ট্রেনের অব্যবস্থায় বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, রেলের হিসাবেই ৯৭ জন মারা গেলেন। সারা দেশের মানুষ জানে মাত্র চার ঘন্টার নোটিসে আকস্মিক লকডাউন জারি করার ফলে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনে কী বিপর্যয় নেমে এসেছিল। লক্ষ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পায়ে হেঁটে হলেও ঘরে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

অথচ দেশে যে কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই থেকে শুরু করে প্রতিদিনের সামান্য খোরাক কীভাবে জোটে তা কেন্দ্রীয় সরকারের জানা ছিল না তা তো নয়! লকডাউন হলে যে এই শ্রমিকদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে, মালিকরা থাকতে দেবে না, এ কথাও কেন্দ্রীয় সরকার জানত। তাহলে লকডাউন ঘোষণার আগেই এঁদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থার কথা ভাবল না কেন সরকার? লক্ষ লক্ষ নাগরিককে এভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারে কোনও সভ্য দেশের সরকার? ভারত সরকার পেরেছে। কারণ তারা তো এই মানুষদের ভরসায় গদিলাভ করেনি। যে টাকার থলির মালিকদের ভরসায় মন্ত্রীত্বলাভ, তাদের সরকার ঠিকই দেখেছে। সরকার এই কোটি কোটি মানুষের দায়ভার ঝেড়ে ফেলেছে প্রথমেই। তাই লকডাউনে বেতন যাতে চালু থাকে তা দেখার কথা প্রধানমন্ত্রী মুখে একবার বললেও ক'দিন যেতে না যেতেই সরকার তা অস্বীকার করল। এমনকী সরকারের বক্তব্য শিরোধার্য করে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত মন্তব্য করলেন, খাবার দেওয়া হলে পরিযায়ী শ্রমিকদের আবার বেতনের দরকার কী? মালিকরাও বুঝে গেল সরকার নিজেই যে দায় ঝেড়ে ফেলেছে, তাদেরও সে দায় বহন করবার দরকার নেই। ফলে শুধু পরিযায়ী নয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রের অগণিত শ্রমিক মৃত্যুর মুখেই দাঁড়ালেন।

অথচ পরিসংখ্যান রাখা কি খুব মুশকিল ছিল? যে সরকার সিএএ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়ার অপচেষ্টায় উমর খালিদদের বিরুদ্ধে ১১লক্ষ পাতার তথাকথিত 'প্রমাণ' সাজাতে পারে, ডাক্তার কাফিল খানের বিরুদ্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাতে পারে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে পূর্বতন চতুর্দশ পুরুষের ঠিকুজি-কুলুজি পর্যন্ত টেনে বার করার পরিকল্পনা নিতে পারে— তারা রাস্তায় হাঁটা এই মানুষগুলির জীবনের খোঁজ রাখতে পারে না! তাছাড়া, শ্রমমন্ত্রী যেদিন কোনও তথ্য নেই বলেছেন তার পরের দিনই রেল দপ্তর বলেছে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের ৯৭ জন যাত্রী পথে মারা গেছেন। আরও তথ্য সংগ্রহ করেছেন স্বেচ্ছাসেবীরা। দেশের এবং বিদেশের আইন ও সমাজতত্ত্বের ৬ জন গবেষক তাঁদের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে 'তেজেশজিএন.কম' নামে ব্লগে প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে এই লকডাউনের সরাসরি ধাক্কায় ৪ জুলাই পর্যন্ত ৯৭১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তার মধ্যে ২১৬ জন অনাহারে, ২০৯ জন পথ এবং রেল লাইনের দুর্ঘটনায়, ৭৭ জন পথ চলার সময় চিকিৎসা না পেয়ে, ৪৭ জন পথচলার ক্লান্তিতে প্রাণ হারিয়েছেন। পুলিশের বর্বর আচরণে প্রাণ গেছে ১২ জনের (দ্য ওয়্যার, ১৬.০৯.২০২০)। ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকা লকডাউনে ঘরে ফেরার পথে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখেই প্রকাশ করেছে। যাতে দেখা যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনায় শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় মধ্যপ্রদেশ। বিজেপির 'সোনার রাজত্বে'র দুটি উজ্জ্বল মুকুটই বটে! অর্থাৎ পরিসংখ্যানে ঘাটতি থাকার কথাটা সত্য নয়।

শুধু পরিযায়ী শ্রমিকই নয়, দেশের আসল মালিক পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ হিসাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লকডাউনের সুযোগে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে শ্রমিকদের এতদিনের অর্জিত সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। উত্তরপ্রদেশ সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে ৮ ঘন্টার বদলে শ্রমদিবসকে ১২ ঘন্টা করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের যখন খুশি ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের যতটুকু অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ছিল, সেগুলি এক এক বিলুপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কংগ্রেস আমলেই। বিজেপি তাকে সম্পূর্ণ করেছে।

অথচ বেসরকারি মালিকদের যথেচ্ছ শ্রমিক শোষণের উপর লাগাম পরানোর কোনও ইচ্ছাই সরকারের নেই। তাই দেখা যাচ্ছে, ফোর্বস পত্রিকার বিচারে এই লকডাউনের মধ্যেই ভারতে ১০০ বিলিয়ন ডলারের মালিকের সংখ্যা বেড়েছে ১৫ জন। ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ আম্বানি এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনী বলে পরিচিত হয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না বিজেপি সরকার তার প্রকৃত প্রভুদের সেবায় এতটুকু ঢিলে দেয়নি। তাই দিনে দিনে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে যাচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ আর সেই সম্পদ গিয়ে জমছে ধনকুবেরদের সিন্দুকে। এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়ম। আর সেই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যই সরকার। স্বাধীনতার পর থেকে যে কাজটা কংগ্রেস করেছে, এখন তা করছে বিজেপি।

বিজেপি সরকার যে নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায় পরিযায়ী শ্রমিকদের দায় ঝেড়ে ফেলেছে তা একদিকে তাদের নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর ফ্যাসিস্ট চরিত্রকে উন্মুক্ত করেছে। একই সাথে তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভয়ঙ্কর জনবিরোধী চেহারাটাকে সামনে এনেছে। বিজেপিকে চেনার পাশাপাশি এই ব্যবস্থার স্বরূপটিকে চিনতে ভুল হলে তাই চলবে না।

গণকনভেনশন

একের পাতার পর

কোনও দেশপ্রেমিক মানুষ এ জিনিস মেনে নিতে পারেন না। রেল শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন গড়ে দৈনিক ২ কোটি ৩০ লক্ষ নিত্যযাত্রী এবং লক্ষ লক্ষ দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার ও সব্জি বিক্রেতারা। এই বিশাল অংশের মানুষ জীবিকাচ্যুত হবেন এবং জীবন হবে দুর্বিষহ। শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তাও থাকবে না। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। রেলের ভাড়া নির্ধারণের ক্ষমতাও চলে যাচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে। ফলে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে যাত্রী ও পণ্যভাড়া ইচ্ছামতো বাড়াবে। বিপর্যস্ত হবে জনজীবন।

শুধু রেল নয়, করোনা সংক্রমণের সুযোগ নিয়ে মোদি সরকার প্রতিরক্ষা সহ

বর্ধমানে বিক্ষোভ। ১০ সেপ্টেম্বর

অন্যান্য সরকারি বিভাগ, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ, তৈলক্ষেত্র, কয়লা ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শিল্পগুলিকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করছে। কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রকে দুপায়ে মাড়িয়ে সংসদ, আইনসভা এবং জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে ভারত পেট্রোলিয়াম, বেঙ্গল কেমিক্যাল, শিপিং কর্পোরেশন, কন্টেনার কর্পোরেশন, দুর্গাপুর, সালেম এবং ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্ট, ভারত আর্থ মুভারস, সিমেন্ট কর্পোরেশন, এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণের (শেয়ার বিক্রি) সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের ৬টি বিমান বন্দর আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সারা দেশে ১০৯টি রুটে ১৫১টি ট্রেন বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি রুটের দূরপাল্লার ট্রেন রয়েছে। শুধু রেল পরিবহণই নয়, সড়ক যোগাযোগ, আকাশপথ ও জলপথেরও বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বেসরকারিকরণের সর্বনাশা এবং চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আজ জরুরি প্রয়োজন হল ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত নাগরিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার। এই উদ্দেশ্যেই ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় নাগরিক কনভেনশন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক, সঙ্গীত শিল্পী, অ্যাডভোকেট, রেলওয়ে হকার ইউনিয়ন, রেলকর্মচারী, রেলে মালবহনকারী ব্যবসায়ী সমিতি, রেল সংলগ্ন ট্যাক্সি-টোটো-অটো চালক ইউনিয়ন, রিক্সা ইউনিয়ন, স্টেশন সংলগ্ন বাজার সমিতি, রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন, রেলওয়ে মোট বাহক ইউনিয়ন, মহিলা রেলযাত্রী সমিতি, বিভিন্ন কালচারাল ফোরাম, সমাজকর্মী প্রমুখ শত শত ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের নেতৃত্ব এই কনভেনশন সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

২ কোটি ১০ লাখ চাকরিজীবী ছাঁটাই

তিনের পাতার পর

যাবে? বামফ্রন্টের বিকল্প উন্নততর বামফ্রন্টের মতো পুঁজিপতি ও তাদের সুবিধাভোগীরা বলছে, পুঁজিবাদের বিকল্প মানবিক পুঁজিবাদ। কিন্তু যে পুঁজিবাদ শোষণমূলক সে কি মানবিক হতে পারে? বিশ্বের কোথাওই পুঁজিবাদ মানবিক নয়, দানবিক। একে টিকিয়ে রাখতে যারা প্রাণপাত করছেন, ছাঁটাইয়ের খাঁড়া তাদের উপর নেমে আসছে। বাঁচার পথ কী? বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে। কিন্তু, কার বিরুদ্ধে লড়াই? শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কী দাবিতে লড়াই? শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে। এ ছাড়া বাঁচার অন্য কোনও পথ নেই। অন্য যে সব পথ পুঁজিবাদীরা দেখায় তা প্রবঞ্চনার।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ রাজ্যের সর্বত্র মৈপীঠ সংহতি দিবস পালন

১৫ সেপ্টেম্বর রাজ্য জুড়ে প্রায় প্রতিটি জেলায় অসংখ্য জায়গায় 'মৈপীঠ সংহতি দিবস' পালিত হয়। মৈপীঠে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের লাগাতার হামলা, খুন, ঘর পোড়ানো, লুঠ, ভাঙচুর, মেয়েদের উপর লাগাতার অত্যাচার ও সন্ত্রাসের শিকার হওয়া কয়েক শত মহিলা বারুইপুরে এসপি অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে এই সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে বেলা ১২টা থেকে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন।

বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অবস্থান থেকে প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বারুইপুর এসপি-র কাছে দাবিপত্র তুলে দিয়ে বলেন, অবিলম্বে ঘর জ্বালানো ও লুঠপাঠের সঙ্গে যুক্ত তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। বলেন, জেল থেকে ছাড়ার পর দুষ্কৃতীরা পুনরায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে শাসানি, খুন ও ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। তিনি বলেন, পুলিশ এভাবে নিষ্ক্রিয় থাকলে আগামী দিনে আরও বড়সড় অনভিপ্রেত ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

সভা পরিচালনা করেন শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার মেয়ে ও দলের কর্মী কমরেড সুতপা জানা। বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএস-এর রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত, মৈপীঠ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও প্রাক্তন প্রধান কমরেড গৌরী মণ্ডল, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মাধবী পণ্ডিত, শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার স্ত্রী গীতা জানা। মুখ্য বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ মণ্ডল। সকল বক্তা আগামী দিনে মৈপীঠের জনগণের উপর নেমে আসা শাসক দলের লাগাতার হামলার মোকাবিলা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ওই দিনে জয়নগর ২ ব্লকে বকুলতলা থানায় দুই হাজারের বেশি মানুষ প্রবল বিক্ষোভ দেখান।

বকুলতলা থানা কীভাবে তৃণমূলের দুর্বৃত্ত ও সমাজবিরোধীদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়েছে তার উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, নানা অছিলায় দলীয় নেতা-কর্মীদের জামিন অযোগ্য ধারায় মিথ্যা দেওয়া হচ্ছে। ২৬ আগস্ট দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলাজুড়ে সমস্ত বেহাল রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবিতে ছিল ঘোষিত অবরোধ কর্মসূচি। শতাধিক স্থানে ওই দিন অবরোধ নির্বিঘ্নে হলেও জয়নগর থেকে জামতলা রুটের নতুনহাট ও মোল্লারচকের মধ্যবর্তী জায়গায় অবরোধে বিনা প্ররোচনায় বকুলতলা থানার পুলিশের সামনে তৃণমূলের দুর্বৃত্তরা সংগঠিত হামলা চালায়। মহিলাদের উপর আক্রমণ করে, পোশাক ছিঁড়ে দেয়, অনেককে গুরুতর আহত হন। এমনকি মোবাইল, টাকা ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা। পুলিশ আক্রান্তদের রক্ষার পরিবর্তে তাদের উপর লাঠি চালায় এবং কয়েকজনকে জবরদস্তি থানায় তুলে নিয়ে যায়। অথচ হামলাকারীদের একজনকেও আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি।

ভবানীপুর, কলকাতা

বকুলতলা থানার সভায় মূল বক্তা ছিলেন জয়নগর লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল। তিনি তৃণমূল সরকারের নেতা-কর্মীদের আপাদমস্তক দুর্নীতির পাঁকে ডুবে থাকার নানা ঘটনা, পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট দলদাসের মতো আচরণের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানান। আইনের রক্ষক পুলিশ-প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ব্যবহার, বেহাল রাস্তা স্থায়ী সংস্কারের দাবিতে এবং সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণকান্তি নস্কর পুলিশকে শাসক দলের দাসত্ব করা থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার দাবি তোলেন। প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারও বক্তব্য রাখেন। তরুণ নস্করের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধিদল পুলিশের অফিসারদের সঙ্গে দাবিপত্র নিয়ে দেখা করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে মৈপীঠ সংহতি দিবস পালনের কর্মসূচি হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নানা প্রান্তে বিক্ষোভ মিছিল, পথসভা, হাটসভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বত্র সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে যৌথ ছাত্র বিক্ষোভ

করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে বর্তমানে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করলেও প্রতিবাদের ক্ষেত্রে কোনওরকম অনুমতি দিতে নারাজ সরকার। সংসদ অধিবেশন শুরু হয়েছে গত ১৪ সেপ্টেম্বর। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচি সংগঠিত করার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হলেও কোনও অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে ২১ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে সমস্ত রকম ফিজিকাল ডিসটেন্স মেইন্টেন করেই কর্মসূচি করা হলেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদীদের বাধা দেয় প্রশাসন। কিন্তু অনড় ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু করে দেন। বিক্ষোভ চলাকালীন বিশাল পুলিশবাহিনী এবং প্রশাসন বারবার গ্রেফতার করার হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদী ছাত্র প্রতিনিধিরা সেখানে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন এ আই ডি এস ও দিল্লি রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড শ্রেয়া সিং। তিনি সভায় বক্তব্যও রাখেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অনলাইনে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবি সহ স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

অধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে বিড়ি শ্রমিকরা

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে আচমকা লকডাউন ঘোষণা করায় অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সাথে রাজ্যের ২৩ লক্ষাধিক বিড়ি শ্রমিক চরম দুর্দশায়। বিগত কয়েক মাস ধরে বিড়ি শ্রমিকদের কোনও কাজ নেই। বর্তমানে কাজ শুরু হলেও তিন চার দিনের বেশি কাজ পাওয়া যায় না। বেশিরভাগ জেলায় মালিকরা এই সুযোগে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরিও কমিয়ে দিয়েছে। বহু বিড়ি শ্রমিক পরিবারে চলছে অনাহার-অর্ধাহার। কেন্দ্রীয় সরকার বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের জন্য সেস তোলা বন্ধ করে জিএসটি চালু করেছে। পূর্বে সেস থেকে প্রাপ্ত টাকায় বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের খরচ চলত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ার উপর কল্যাণ প্রকল্পের টাকা নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা কম দেওয়ায় কল্যাণ প্রকল্পের বহু সুবিধা থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার ৪৪টি শ্রম আইনকে ৪টি লেবার কোডে রূপান্তরিত করায় বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ আইন-১৯৭৬ বাতিল হয়ে যাবে।

বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, লগবুক, পিএফ, পেনশন, বোনাস চালু ইত্যাদি ১৫ দফা দাবিতে এআইইউটিইউসি পরিচালিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর দাবি সপ্তাহ পালন করেন বিড়ি শ্রমিকরা। বিভিন্ন জেলায় ডিএম, এসডিও, বিডিও, এএলসি, ডিএলসির কাছে দাবিপত্র নিয়ে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন। বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে এই কর্মসূচি ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

বিড়ি শ্রমিকদের ১৫ দফা দাবিতে ৮ সেপ্টেম্বর অনলাইনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার নিজাম প্যালেসে গিয়ে ওয়েলফেয়ার কমিশনারকে দাবিপত্র দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে এই দাবিগুলি নিয়ে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বিড়ি শ্রমিকদের বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করতেই কর্মচারীদের ইউনিয়নে আপত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের

প্রতিবাদ জানাল এস ইউ সি আই (সি)

এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলিকে নিজস্ব সংবিধান সংশোধন করে নিজেদের নাম থেকে 'ইউনিয়ন' শব্দটি বাতিল করবার যে স্বৈরাচারী নির্দেশনামা দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। এই নির্দেশনামায় বলা হয়েছে, সরকারি কর্মচারী সংগঠনের পদাধিকারীদের দুই বছরের বেশি সাংগঠনিক দায়িত্বে রাখা যাবে না। কয়েকদিন আগেই, কেন্দ্রীয় সরকার একটি অফিস মেমরেনডামে সরকারি কর্মচারীদের কাজের নিয়মিত সরকারি মূল্যায়ন করার নির্দেশ দেয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসকদের চূড়ান্ত ক্ষমতা দেয় মেয়াদ ফুরোবার আগেই জনস্বার্থের অজুহাতে সরকারি কর্মচারীদের ইচ্ছামতো অবসর গ্রহণে বাধ্য করার দ্বারা চরম প্রশাসনিক ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করার। শুধু তাই নয়,কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার ঘোষণা করেছে।

কোভিড মহামারির এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে সরকারের এই সব জনবিরোধী পদক্ষেপের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য আছে। তা হল, কর্পোরেট দস্যুদের লুটতরাজের স্বার্থে সরকার যে সব আঘাত নামিয়ে আনছে, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী ও খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠকে দমন করা।

এই ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে আমরা দৃঢ়তার সাথে এই নির্দেশনামা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি এবং সরকারের এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনতা ও বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীদের শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি উদাসীনতার প্রতিবাদে মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় সরকারের অবিবেচনাপ্রসূত লকডাউনের পরিণতিতে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের রেকর্ড ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদে দাঁড়িয়ে চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা ১৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, চরম সরকারি ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় ওই দিন ডিএম, এসডিও, বিডিও সহ নানা প্রশাসনিক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, শ্রমিকদের নাম রেজিস্ট্রেশন করা, পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যে গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান প্রকল্প চালু করার দাবি জানানো হয়।

রেল বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ডেপুটেশন

রেল বেসরকারিকরণ, ছাঁটাই, প্ল্যাটফর্মের টিকিট ৫০ টাকা, ১৫১টি ট্রেন বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ১৭ সেপ্টেম্বর এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) হরিশ্চন্দ্রপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর শহিদ মোড়ে বিক্ষোভ সভা ও স্টেশন পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকার। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন হরিশ্চন্দ্রপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড উজ্জ্বলেন্দু সরকার, কমিটির সদস্য কমরেড মোশারফ হোসেন, কমরেড রবীন্দ্র রাম, কমরেড রাজিউল ইসলাম ও কমরেড শ্যামচাঁদ সাহা।

১০ সেপ্টেম্বর সিউড়ি স্টেশনে বিক্ষোভ

মদের ব্যাপক বিক্রি বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বালুরঘাটে বিক্ষোভ

আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

১০ সেপ্টেম্বর আশা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নদীয়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ সভা হয়। আশা কর্মীদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম, তারপর অতি সম্প্রতি অন্যান্য কাজের সাথে কোনওরকম সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই কো-মর্বিডিটি সার্ভের কাজ চাপানো হচ্ছে তাদের উপর। এর প্রতিবাদে সুরক্ষা সরঞ্জাম ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক সহ ৫ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখান ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন দেন শতাধিক আশা কর্মী। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সভাপতি অপর্ণা গুহ।

আশাকর্মীদের স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বীকৃতি, পিএফ, পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি, জুলাই মাস থেকে প্রাপ্য করোনা অ্যালাউন্স, কোভিড আক্রান্তদের সরকার ঘোষিত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস, সব ব্যাপারে উপযুক্ত ট্রেনিং ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া সহ ৮ দফা দাবিতে ১৪ সেপ্টেম্বর কোচবিহার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাজে ডেপুটেশন দেন জেলার আশাকর্মীরা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কাজ হারানো সকল শ্রমিককে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিতে হবে

দাবি এ আই ইউ টি ইউ সি-র

এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ২১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, করোনা সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছেন শ্রমজীবী মানুষ। পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনাতীত। পশ্চিমবঙ্গের নির্মাণ শ্রমিক, হকার, বিড়ি শ্রমিক সহ বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দুর্দশা কল্পনাতীত। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণ প্রকল্প আছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি পরিচয় প্রাপ্ত বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ লক্ষের বেশি। ৮ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক এখনও সরকারি পরিচয় পত্র পাননি। কারণ বিগত ২ বছর পরিচয় পত্র দেওয়ার কাজ বন্ধ আছে। এই কারণে লকডাউনের ফলে কাজ হারা বিড়ি শ্রমিকরা কল্যাণ তহবিল থেকে কোনও সাহায্য পাননি।

পশ্চিমবঙ্গে অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে (এসএসওয়াই) ১ কোটি ২২ লক্ষের বেশি শ্রমিক নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। এঁদের মধ্যে নির্মাণ কর্মী ও পরিবহণ কর্মীদের জন্য কল্যাণ প্রকল্পের তহবিল আছে। এই তহবিলে কয়েক হাজার কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে কর্মহারা কোনও শ্রমিককেই সাহায্য করেনি রাজ্য সরকার। যদিও এখানে উল্লেখ্য দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় স্বাভাবিক সময়ে এসএসওয়াই প্রকল্প থেকে তালিকাভুক্ত শ্রমিকরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে আর্থিক অনুদান পান। করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে অনুদান পাওয়ার আবেদন পত্র অনলাইনে জমা নেওয়ার কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ আছে। ফলে শ্রমিকার কোনও সাহায্যই পাচ্ছেন না।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মে মাসে নির্মাণ সহ অন্যান্য শ্রমিকদের অনুদান দেওয়ার দাবি জানানো হয়। কিন্তু ফলপ্রসূ কিছু না হওয়ায় পুনরায় ২৭শে আগস্ট শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথে দেখা করে এই দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ১৫ দিনের মধ্যে এস এস ওয়াই 'র অনলাইন আবেদন পত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হবে। কিন্তু এখনও এই কাজ শুরু হয়নি। তাই আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে আবেদন পত্র জমা নেওয়া ও অনুদানের টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করতে হবে এবং নির্মাণ শ্রমিক সহ সকল কাজ হারা শ্রমিকদের ১০ হাজার টাকা এককালীন সাহায্য করতে হবে।

আসামে বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন

আসামে বাস সহ পরিবহণের ভাড়া ২-৩ গুণ বাড়ানোর প্রতিবাদে এসইউসিআই(সি) আসাম রাজ্য কমিটির আহ্বানে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সামিল হন বহু মানুষ। অতিমারি পরিস্থিতিতে বাস ও অন্যান্য পরিবহণে ৫০ শতাংশ যাত্রী নেওয়ার অজুহাতে বিপুল পরিমাণ ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। লকডাউনে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের কাছে ভাড়াবৃদ্ধি একটা মারাত্মক বোঝা। আসামের বিজেপি সরকার মদত দিয়ে চলেছে এই ভাড়াবৃদ্ধিতে। দলের পক্ষ থেকে সরকারের এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে পরিবহণে সরকারি ভতুর্কির দাবি জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল ফেরানোর দাবি পুরুলিয়ায়

জেলার প্রাথমিক হাসপাতালগুলির বেহাল দশার পরিবর্তন, প্রতিটি হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার-নার্স নিয়োগ, বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পুনরায় চালু, করোনা সংক্রমণের অজুহাতে হাসপাতালে বন্ধ হয়ে যাওয়া পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে ১৪ সেপ্টেম্বর দলের পুরুলিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ)-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ওই দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ, পরিযায়ী শ্রমিক সহ সকল বেকারের কাজ, মদের প্রসার বন্ধ সহ নানা দাবিতে ডিএম ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শহরের জুবিলি ময়দান থেকে মিছিল করে ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুবর্ণ কুমার।

করোনা যুদ্ধে সুরক্ষার দাবি গ্রামীণ ডাক্তারদের

করোনা মোকাবিলার জন্য নন-রেজিস্টার্ড প্র্যাক্টিশনার্সদের অনলাইন যোদ্ধার স্বীকৃতি, গ্লাভস, মাস্ক, হেড-গিয়ার, স্যানিটাইজার সরবরাহ, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনা, করোনায় মৃত প্র্যাক্টিশনার্সদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ভগ্নদশা অবিলম্বে নিরসন করা সহ নানা দাবিতে ১৮ সেপ্টেম্বর প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার আহ্বানে ইনফর্মাল প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা (নন-রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিশনার) রাজ্যজুড়ে অনলাইন প্রতিবাদ দিবস পালন করেছে। সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে ১৬ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যভবনে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ওয়েলফেয়ারের কাছে এই দাবির সমর্থনে ডেপুটেশন দেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

বনাঞ্চলের সমস্ত মানুষের জন্য পাট্টার দাবি আড়ষায়

দখলিকৃত বনাঞ্চলের সমস্ত মানুষকে পাট্টা দেওয়া, এলাকার সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ, পাট্টা জমিকে চাষযোগ্য করা সহ নানা দাবিতে ৩ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়ায় 'জনঅধিকার সুরক্ষা কমিটি' আড়ষা শাখার পক্ষ থেকে আড়ষা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পাঁচ শতাধিক মহিলা-শিশু-ছাত্র-যুব-বৃদ্ধ মিছিলে পা মেলান। আদিবাসী মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলে নেতৃত্ব দেন এলাকার গণআন্দোলনের নেতা সাগর আচার্য, অনাদি কুমার, রামপিরিত মাহত, প্রহ্লাদ সিং লায়া, বিজয় সিং মুড়া প্রমুখ।

আদিবাসী নাবালিকাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে
জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়িতে দুই আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও অপমানে এক জন নির্যাতিতার আত্মহত্যার প্রতিবাদে এমএসএস, ডিএসও এবং ডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রাজগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com